২।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

।। এক ।।

যে কোন রিপোর্ট, প্রতিবেদন বা সমীক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝার উপায় হচ্ছে তার কাল, প্রেক্ষিত ও পটভূমির ভিত্তিতে বুঝা। জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪), যা কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট হিসেবে সমধিক পরিচিত, তার ব্যাপারেও একই কথা। ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বাধীন এই কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই। কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ভারত সফরে পাঠানো হয়েছিল ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে কমিশন তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

লক্ষণীয়, এই কমিশন গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাত্র ৭ মাস পর। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কোন কিছুই তখনো পর্যন্ত সুসংবদ্ধ বা সুবিন্যস্ত হয়নি। অর্থনীতি, আইন-শৃংখলা কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কোথাও কোন সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সময়টা ছিল সম্পূর্ণরূপেই এক অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও কনসলিডেশনহীনতার সময়।

অন্যদিকে তখন দেশে চলছিল কার্যতঃ এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক একদলীয় শাসন, যা অনেকের মতেই ছিল স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর। সরকার দলীয় ক্যাডার ও বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনীর দাপট তখন প্রায় জার্মান গেস্টাপোদের দাপটেরই কাছাকাছি। সরকার ও সরকারী দলের সামান্যতম সমালোচনা বা বিরোধিতার অর্থ তখন ধনে প্রাণে মৃত্যু।

আর্থ-সামাজিক এই নৈরাজ্যের পাশাপাশি তখন শুরু হয় মুজিববাদ নামক এক অভূতপূর্ব দর্শনের তান্ডব। বলা হয়, মুজিববাদের চার ভিত্তি ঃ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চার নীতিকেই গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে। কিন্তু এর স্ববিরোধিতা ও অবাস্তবতার ব্যাপারে টু-শব্দটি উচ্চারণ করার সাধ্য তখন কারো ছিল না।

বস্তুতঃ পুঁজিবাদ ও শোষণভিত্তিক গণতন্ত্র এবং একনায়কত্ব ও সমতাভিত্তিক সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ স্ববিরোধী ও সাংঘর্ষিক কনসেপ্ট। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একসংগে কায়েম করা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে একত্রিত করারই সমতুল্য। তদুপরি, সমাজতন্ত্র আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী বিধায় জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের পরিপন্থী। সবচেয়ে বড় কথা, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য অপরিহার্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক ক্যাডার ও নেতৃত্বভিত্তিক সংগঠন, যেমনটি গড়ে উঠেছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন কিংবা উত্তর কোরিয়ায়। অথচ তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ছিল যাবতীয় পেটিবুর্জোয়া ত্রুটিসম্পূর্ণ একটি পরিপূর্ণ পেটিবুর্জোয়া সংগঠন। দেশের সমস্ত ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য বল্গাহীন উন্মত্ত তৎপরতায় যারা লিপ্ত ছিল তারাই তখন আওয়াজ তুলেছিল মুজিববাদের, মুজিববাদী সমাজতন্ত্রের।

আগেই বলা হয়েছে, উপরোক্ত চার মূলনীতির সংমিশ্রণ যে এক অসম্ভব-অবাস্তব ব্যাপার, তা উল্লেখ করার মতো বুকের পাটা তখন কারোরই ছিল না। বরং চাকরি রক্ষার স্বার্থে সরকারী কর্মচারীরা এবং অস্তিত্ব রক্ষা ও ফায়দার স্বার্থে বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একাট উল্লেখযোগ্য অংশ ওই চার নীতিরই শর্তহীন স্তুতির উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কুদরত-ই-খুদা কমিশনের পক্ষেও এই পরিস্থিতির উর্ধ্বে উঠে কোন রিপোর্ট তৈরী করা সম্ভবপর ছিল না। তাই "শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" শীর্ষক অধ্যায়সহ বেশ কতিপয় জায়গায় তাদের বলতেই হয়েছে যে, জাতীয় শিক্ষা নীতি গড়ে উঠবে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে। কিন্তু একই সংগে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কিভাবে কায়েম হবে, এ ব্যাপারে কমিশনের সম্ভবতঃ কোন সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না। তাই ফাঁপা শ্লোগানের মতো মাঝে-মধ্যে চার রাষ্ট্রীয় নীতির বিশেষতঃ সমাজতন্ত্রের দোহাই পড়লেও, এর প্রায়োগিক রূপ কি হবে; শিক্ষার্থীরা কিভাবে একই সংগে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে, তার কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখাই রিপোর্টের কোন অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়নি। আবার চার রাষ্ট্রনীতি বা তৎকালীন শাসক এলিটদের ইচ্ছা বা খেয়ালের পরিপন্থী হতে পারে এই ভয়ে অপর কোন লক্ষ্য বা আদর্শ স্থির করাও কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে রিপোর্টটি কার্যতঃ পরিণত হয় নৈতিক ভিত্তিবিহীন অনেক কথা ও সুপারিশের নিছক এক মিশ্রণ বা কঙ্গলোমারেশনে।

তৎকালীন অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্মকর্তাদের মতো এই কমিশনের সদস্যরাও সম্ভবতঃ বুঝেছিলেন যে, চার রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারটাই অধিকতর মুখরোচক এবং সহজগ্রাহ্য। আর তখন ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ছিল ইসলাম ধর্মের সর্বাত্মক বিরোধিতা এবং ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের নির্মূল করে দেয়ার হিংস্র প্রতিজ্ঞা। কমিশন সদস্যরা সম্ভবতঃ এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামের প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা দেখালেও তাদের গোটা রিপোর্ট তো পত্রপাঠ বাতিল হয়ে যাবেই, তাদের জীবন সংশয় দেখা দেয়াও বিচিত্র নয়। স্বভাবতঃই তাদের এই উপলব্ধির প্রতিফলনও তাদের রিপোর্টে ঘটেছিল এবং তা ঘটাতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মকেও কার্যতঃ উচ্ছেদ করে দিতে হয়েছিল।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, এই উপমহাদেশের বিশেষতঃ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এই ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করে। কিন্তু টোল শিক্ষা ব্যবস্থা উপমহাদেশেই আজ বিলুপ্তপ্রায়, বাংলাদেশে তো তা বলতে গেলে অস্তিত্বহীন। অথচ কমিশন সজীব মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত প্রায় টোল শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত করে দেন এবং 'মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা' শীর্ষক একটি দায়সারা গোছের অতিক্ষুদ্র অধ্যায় সংযোজন করে কার্যতঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করারই প্রয়াস পান। সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামেও ধর্ম শিক্ষাকে এক অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে কমিশন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে কিছু প্রশ্নমালা পাঠিয়েছিলেন। এতে ধর্মশিক্ষা ও মাদ্রাসার ব্যাপারেও কতিপয় প্রশ্ন ছিল।

(চলবে)